। খে । লা ।

আমলা সাঁতার

নাজমুল হক তপন

সর্বশেষ ইসলামাবাদ সাফ গেমসে সাঁতার থেকে বাংলাদেশের একমাত্র স্বর্ণপদকটি জিতেছেন রুবেল রানা। চার বছর পর পুলে নেমেই ঝড় তোলেন সবুরা খাতুন। জাতীয় রেকর্ডসহ ৮টিতেই স্বর্ণ পান সবুরা। কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার ছোট্ট গ্রাম আমলা আর সাঁতার গত এক দশক ধরেই মিলেমিশে একাকার। গত এক দশকে দেশসেরা সাঁতারুদের প্রায় সবাই এসেছেন আমলা থেকেই।

কিন্তু একেকজন রুবেল রানা কিংবা সবুরা হয়ে ওঠার পেছনের অধ্যায়টুকু অজানাই থেকে গেছে দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে। বাংলাদেশ সাঁতারের যারা দেখভাল করেন তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই (!) ভুলে থাকেন দেশের একমাত্র এই সাঁতার কারখানার কথা। সাঁতারু তথা আমলাবাসীর প্রাণের দাবি একটা সুইমিংপুল। সেই দাবি রাষ্ট্রের কাছে এ দেশের মানুষের নিরাপত্তা পাওয়ার মতোই পরিণত হয়েছে একটা অর্থহীন ব্যাপারে। গত এক দশকে দেশকে শুধু ঋণীই করে গেছে তারা। বিনিময়ে সাহায্য-সহযোগিতা তো অনেক দূরের কথা, সামান্য সহানুভূতিটুকও জোটেনি তাদের। খাবার নেই, অভাব নিত্যসঙ্গী, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই, জীবনযাপনের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও নেই। অপুষ্টিতে ভোগা শত শত শিশু তারপরও সাঁতার কাটে। কুষ্টিয়ায় একটা প্রবাদ খুবই জনপ্রিয়- 'সাঁতারের ওপর পানি নাই।' যারা বছরজুড়েই বিপদে থাকে নতুন করে আর কোনো বিপদ স্পর্শ করে না তাদের। বাংলাদেশের মানুষকে এই প্রবাদটি যেন বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এখানকার সাঁতারুরা।

একটি সোনা জয় মানেই একটি চাকরি

কেন জান বাজি রেখে আমলার ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই দেবেন বিশেষজ্ঞ মতামত। কিন্তু আমলা গ্রামের ৭-৮ বছরের শিশুটিও জানে এ প্রশ্নের উত্তর। জাতীয় পর্যায়ে একটি সোনা জেতা মানেই সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা বিমানবাহিনীর একটি চাকরি। বয়স কম হলেও সমস্যা নেই। আনসার কিংবা বিজেএমসি তো আছেই। সোনাজয়ী একজন ক্ষুদে সাঁতারুর জন্য এক হাজার টাকার ভাতা দেয় আনসার। তবে শর্ত- খেলতে হবে তাদের হয়ে। এ অঞ্চলে যাদের সামর্থ্য আছে ছেলেমেয়েকে

আমলা সাঁতার কারখানার শিক্ষার্থীদের একাংশ

স্কুলে পাঠানোর, সেইসব পরিবার থেকে সাঁতার কাটতে সচরাচর কেউ আসে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করে দিলেন স্থানীয় গড়াই সুইমিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমেদ। তার কথা, ধরুন এ বছর বগুড়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার কথাই। পুলে আমাদের ছেলে জেহাদকে দেখে খুবই পছন্দ হয়ে গেল সেনাবাহিনীর এক মেজরের। আবদুল মালেক জেহাদকে যোগাযোগ করতে বললেন মেজর। এভাবেই চাকরি পায় ছেলেরা। সেনা, বিমান নৌ, বিজেএমসি কিংবা আনসার মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৫০-৬০ জনের মতো চাকরি করছে বলেও জানান তিনি। স্থানীয় ব্যাংকার হাসানুজ্জামান টুটুল বললেন, এ রকম একটি জায়গা থেকে খুবই ছোট একটা চাকরি পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার শামিল। গরিব মানুষের চাকরি মানেই পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর সিপাহি। পুলিশের সিপাহি র‍্যাঙ্কের একটি চাকরির জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। তাছাড়া ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাও লাগে। বিপরীতে ক'টা বছর জানপ্রাণ দিয়ে সাঁতার কাটলে সেই আকাশের চাঁদটা হয়ে যায় মুঠোবন্দি। আর তাই ক্ষুদে সাঁতারুদের একটাই স্বপ্ন- সোনা জয় কর, তবেই মিলবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ, ছোট্ট একটি চাকরি।

অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের সাঁতারু হয়ে ওঠার কাহিনী

আমলা, সদরপুর, আজমপুর ও নওদা আজমপুর- মূলত এই ৪টি গ্রামকে ঘিরেই সাঁতারের চাষবাস। আমলার ১ বর্গকিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এ মহাযজ্ঞ। এখানে আছে ৪টি সুইমিং ক্লাব। এদের মধ্যে সাগরখালী ও গড়াই সুইমিং ক্লাব জাতীয় সুইমিং ফেডারেশন কর্তৃক রেজিস্ট্রারভুক্ত। বাকি দুটি আমলা ও পপুলার সুইমিং ক্লাব এখনো রেজিস্ট্রেশন পায়নি। যেহেতু ফেডারেশনের নথিভুক্ত আর তাই গড়াই ও সাগরখালীর প্রাণচাঞ্চল্যও বেশি। প্রতিটি ক্লাবেই আছে বিশাল কলেবরের এক গভর্নিং বডি। যেমন গড়াই ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদ ৪১ সদস্য নিয়ে গঠিত। ৮-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাঁতারু হিসেবে তৈরি করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বেশি বয়সী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাত্র ২০ টাকার একটা ফরম কিনেই এসব ক্লাবের সদস্য হতে পারে শিক্ষার্থীরা। ফরম বিক্রি বাবদ ২০ টাকা ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো আয় নেই ক্লাবগুলোর। প্রতিটি ক্লাবের বার্ষিক খরচ কোনোভাবেই ২৫ হাজার টাকার কম নয়। এ টাকা আসে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায়। অর্থ আয়ের ঝড়টা সামলানোর অলিখিত দায়িত্বটা এসে বর্তায় ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির ওপর। প্রতিটি ক্লাবের কোচই অবৈতনিক। কোচ পাওয়াতেও তেমন

কোনো সমস্যা নেই। টাকা-পয়সার তীব্র অভাব থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে সোনাজয়ী সাঁতারুদের কোনো অভাব নেই এখানে। সিনিয়র সাঁতারুরাই এই ক্লাবগুলোর কোচ। যেমন গড়াই ক্লাবের প্রধান কোচ শরিফুল ইসলাম। বহু আলোচিত সাঁতারু সাবেরার স্বামী শরিফুল। ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত টানা ৮ বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার কৃতিত্ব আছে শরিফুলের। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ৪টি করে সোনা পান তিনি। বর্তমানে শরিফুল পালন করছেন বিজেএমসির সহকারী কোচের দায়িত্ব। সাগরখালী ক্লাবের কোচ মনিরুল ইসলাম। ১৯৯৩ সালে জাতীয় জুনিয়র প্রতিযোগিতায় একাধিক স্বর্ণপদকসহ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

দেশসেরা সাঁতারু তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি স্থানীয় উদ্যোগে ও দাতব্য ধাঁচে। আগেই বলা হয়েছে, এলাকার সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলো থেকে সাঁতার শিখতে আসে ছেলেমেয়েরা। স্থানীয় এক স্কুলশিক্ষক বললেন, নতুন আসা ছেলেমেয়েদের এমনই দুরবস্থা যে, ১০ টাকা দিয়ে একটি নাইলনের জাঙ্গিয়া কিনবে সেই সামর্থ্যও থাকে না। কেউ কেউ দর্জির দোকান থেকে কমদামি কাপড় দিয়ে সুইমিং কস্টিউমের বিকল্প কিছু একটা বানিয়ে নিয়ে পানিতে নামে। একজন সাঁতারু তৈরি হতে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি ভালো খাওয়া-দাওয়া।

স্বাভাবিক তিন বেলা খাবারের পাশাপাশি ডিম, দুধ ও ফল মিলিয়ে আরো কিছু খাবার প্রয়োজন সাঁতারুদের। এ জন্য গড়ে প্রতিদিন ২০-২৫ টাকার মতো খরচ হয় একজন সাঁতারুর; কিন্তু প্রায় কারোরই এ টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। শুধু খাবারের অভাবে প্রত্যাশিত সুফল আসছে না- ক্ষোভের সঙ্গে এমন কথা জানালেন অনেকেই। গড়াই সুইমিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমদ জানান, দু'বেলা ভাতই জোটে না, ডিম-কলার পয়সা পাবে কোত্থেকে। ফুডিংয়ের অভাবে সময়টাও বেশি লাগছে। মনে করুন, একজনের মধ্যে প্রতিভা আছে। আমরা জানি, ২ বছর প্রশিক্ষণ দিলেই সে জাতীয় পর্যায়ে সোনা জিতে আসবে; কিন্তু প্রত্যাশিত খাবার পায় না বলে দক্ষ হতে তার লেগে যাচ্ছে ৩/৪ বছর। ভালো খাবারের অভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে সাঁতারুদের বেশি সময় লাগছে- এমন কথা বলেছেন আমলা বাজারে উপস্থিত সব মানুষই।

সুইমিংপুলে নামানোর আগে ছেলেমেয়েদের নিয়মিত ফিল্ড প্র্যাকটিস করানো হয়। এ জন্য যে ধরনের জিম সুবিধা দরকার তার কিছুই নেই এখানে। একসময় খোলা আকাশের নিচে শরীরচর্চা করতো ছেলেমেয়েরা; কিন্তু খোলা জায়গায় গ্রামের মধ্যে শিক্ষার্থীদের এহেন অনুশীলন খুব শোভনীয় নয়। কমপক্ষে চারদেয়ালে ঘেরা জায়গা প্রয়োজন। আমলা কলেজের পরিত্যক্ত ঘরগুলোকে বেছে নেয়া হয় ইনডোর প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে। ভেজা স্যাঁতসেঁতে কামরাগুলোতেই বছরজুড়ে চলে জোর অনুশীলন। শিক্ষার্থীদের পানিতে নামানোর ঝুঁকিও

RvZxq mvZv‡i †mvbv R‡qi gn‡Z mei v

কম নয়। অপুষ্টিতে ভোগা ছেলেমেয়েরা নেতিয়ে পড়ে অল্পতেই। অল্পতেই ঠাণ্ডা লেগে যায় তাদের। প্র্যাকটিস করার সময় ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকে। প্রায় প্রতিদিনই অহত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে কেউ না কেউ। কোচরাই যেখানে অবৈতনিক, সেখানে চিকিৎসা খরচ জোগানোর সামর্থ্য নেই শিক্ষার্থী কিংবা ক্লাব কারোরই। বছর দুয়েক আগে ঘটে গিয়েছিল বড় ধরনের একটি দুর্ঘটনা। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা থেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় এক শিশু। চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অকালেই ঝরে পড়ে একটা ফুল। তারপর থেকে খুবই সতর্ক ক্লাবগুলো। বিশেষ করে শীতকালে শিক্ষার্থীদের পুলে নামানোর ব্যাপারে বড় রকমের নিষেধাজ্ঞা আছে ক্লাবগুলোর পক্ষ থেকে। নতুন শিক্ষার্থীদের শীতকালে নামতে দেয়া হয় না পুকুরে। যারা কেবল অভিজ্ঞ এবং বাইরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদেরই অনুমতি দেয়া হয় পানিতে নামার।

সাঁতার কারখানার হালহকিকত

আমলার একজন ক্ষুদে শিক্ষার্থীকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ঢাকার সুইমিংপুলের সঙ্গে এখানকার পার্থক্য কি? সবার উত্তর হবে একটাই- আমাদের পানির চাইতে ঢাকার পানি পাতলা। ঢাকার পানিতে বেশি জোরে সাঁতার কাটা যায়। উত্তরটার মধ্যে যথেষ্ট গ্রাম্যতা আছে। তবে এটা এমন এক শাশ্বত সত্য যেটাকে অনুধাবন করার সামর্থ্য এ দেশে কারোরই নেই। আমলা কলেজের পেছনে পাশাপাশি দুটো বড় পুকুর। পুকুরের চারপাশে বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠছে ঝোপঝাড়, গাছপালা। মাত্র ২ বছর আগেও পুকুর দুটিতে মাছের চাষ হতো। বর্ষার সময় নোংরা পানিতে সয়লাব হয়ে যায় পুকুর দুটো। ঝোপঝাড়, পচা পাতা মিলেমিশে নষ্ট করে দেয় পানির স্বাভাবিকতা। আজকের আমলার সাঁতার এবং এই দুটি পুকুর এক ও অভিন্ন। আমলার সব সাঁতারুই এই দুটি পুকুরের সন্তান। আধুনিক সুইমিংপুলের ঝকঝকে পানির প্রত্যাশা করাটাই এখানে বাতুলতা। আশপাশের বর্জ্য মিলেমিশে পানিকে করে তোলে সাঁতারের অনুপযোগী। শিক্ষার্থীদের ভাষায়, আমাদের পানি ভারী। শরিফুল ইসলাম তার এ প্রাণপ্রিয় পুকুর সম্পর্কে বলেছেন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই এখানে। সুযোগ নেই পানি পরিবর্তনের। পানি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা দরকার, সে সব আমাদের নাগালের বাইরে। সাঁতার তৈরির কারখানার 'নেই'-এর হিসাব কষতে গেলে হয়ে যাবে একখানা মহাকাব্য। তবে দু'একটি কথা না বললেই নয়। যেমন বিশেষ ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার আগে ১ মাসের একটা ক্যাম্পিংয়ের আয়োজন করে থাকে এ ক্লাবগুলো। মূলত টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের ২৪ ঘন্টা ক্যাম্পিংয়ের সুবিধা দিতে পারে না ক্লাবগুলো। ক্যাম্পিং ১ মাসের জায়গায় ৩ মাস করতে পারলে আরও বেশি সাফল্যের ফসল ঘরে উঠত বলে মনে করে স্থানীয়রা। ক্যাম্পিংয়ের সময় খাবার-দাবারের জন্য জনপিছু যে ২০-২৫ টাকা খরচ হয় সেটাও বহন করে ক্লাবগুলোই। এছাড়া মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সময় প্রতিযোগীদের যাতায়াত ভাড়া ছাড়াও হোটেল খরচও বহন করে থাকে এ ক্লাবগুলোই। সবমিলিয়ে একটা ক্যাম্পিং মানে ৮-১০ হাজার টাকার ধাক্কা। বলা বাহুল্য, এটাও নিজেদের উদ্যোগেই করতে হয় ক্লাবগুলোকে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় যারা কেবল চূড়ান্তপর্বে অংশ নিতে পারে কেবল তারাই পায় টিএ/ডিএ; কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার জন্য নিজ উদ্যোগেই বেশি বেশি করে শিক্ষার্থী নিয়ে যায় তারা। তাছাড়া জাতীয় প্রতিযোগিতার দিকে চেয়েই সারাবছর অনুশীলন করে ছেলেমেয়েরা। তাদের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখাটাকেও কর্তব্য জ্ঞান করে এ স্থানীয় ক্লাবগুলো।

সবার মানসম্মান বাঁচানোর দায় আমলার

সাঁতারে বাংলাদেশের মানসম্মান বাঁচিয়ে রেখেছে আমলা। এটা মোটামুটি সবাই জানে; কিন্তু দেশের অন্য জেলাগুলোর মানসম্মানও যে তারাই বাঁচিয়ে রেখেছে এ খবরটা অনেকেরই জানা নেই। জাতীয় সুইমিং ফেডারেশনের একটি নিয়ম আছে। এই নিয়ামানুযায়ী জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে একটি ক্লাব কিংবা একটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে এক ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন না দু'জনের বেশি সাঁতারু; কিন্তু প্রতিটি ইভেন্টে চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়ার মতো অসংখ্য যোগ্য সাঁতারু আছে এখানকার ক্লাবগুলোর। আর এ সুযোগটাই নিচ্ছে অন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ক্লাবগুলো। আমলার ছেলেমেয়েরা অন্য ক্লাব এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে অংশ নিচ্ছে জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলোতে। সর্বশেষে আসরে স্বাগতিক বগুড়া লাভ করেছিল তৃতীয় স্থান। এর প্রায় সব সোনাই এসেছিল আমলার সাঁতারুদের সৌজন্যে। প্রতিটি প্রতিযোগিতার আগে মেহেরপুর, পাবনা,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ- এমন অনেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাই ধরনা দেয় আমলার ক্লাবগুলোর কাছে। তাদের বক্তব্য, আমাদের মানসম্মান বাঁচাও। এখানকার স্থানীয় ক্লাবগুলো অন্য সব জেলার মানসম্মান বাঁচানোর মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে।

সুইমিংপুল থেকে গেল স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাই

সর্বশেষ বগুড়া জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে ১০০-র মধ্যে ৫৩টি স্বর্ণপদকই পেয়েছে আমলার ছেলেমেয়েরা। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সাঁতারের জীয়নকাঠিটি তাদেরই হাতে। প্রতিবারই সোনা জেতার পর এখানকার ছেলেমেয়েরা বলে, 'আমরা নিজের জন্য কিছু চাই না। আমরা আমলাতে একটা আধুনিক সুইমিংপুল চাই।'

আমলাতে কেন সুইমিংপুল নেই, এটা নিয়ে স্পোর্টস রিপোর্টাররা নষ্ট করেন বিস্তর কালি-কাগজ। আশ্বাসও দেয়া হয় ওপর মহল থেকে; কিন্তু এ যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসি- যথা পূর্বং তথা পরং। ১০ বছর আগেও যা ছিল এখনও তাই। দাবি থেকে গেছে দাবির পর্যায়েই। গত এক দশক ধরে বারবার দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর একটি রাজনীতির চাল কিন্তু ধরে ফেলেছে আমলাবাসী। নজরুল ইসলাম নামে এক ব্যাংকার ভদ্রলোক বললেন, গত ৩ বছরে দেশে গোটা তিনেক সুইমিংপুল তৈরি হয়েছে। এগুলো হয়েছে গোপালগঞ্জ, বগুড়া ও চাঁদপুর জেলায় (এখনও নির্মাণকাজ চলছে)। এ তিন জেলার সাঁতার বলতে কি কিছু আছে? এরা তো মান বাঁচায় আমলার সাঁতারুদের নিয়েই। তবে কেন আমলাতে সুইমিংপুল হয় না। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খেয়াল করবেন তিনটি জেলা রাজনৈতিকভাবে খুবই পাওয়ারফুল। বগুড়া, গোপালগঞ্জ তো বটেই, বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গনে চাঁদপুরও কম প্রভাবশালী নয়। এ অঞ্চলে তারকা রাজনীতিবিদ নেই আর তাই সুইমিংপুল হচ্ছে না আমলাতে।

সবুরাদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও

আগেই বলা হয়েছে, সবুরার স্বামী অন্যতম দেশসেরা সাঁতারু শরিফুল ইসলাম। আমলা বাজার থেকে কলেজের দিকে ২০০ গজের মতো হেঁটে বাঁ দিকে গেলেই সবুরার শ্বশুরবাড়ি। বাড়িতে প্রবেশ করতেই থমকে যাবেন আপনি। এই সেই দেশবরেণ্য সবুরার বাড়ি। বাংলাদেশ মহিলা সাঁতার ইতিহাসের জীবন্ত কিংবদন্তি সবুরা। থাকেন মাটির ঘরে। ঘরের আসবাবপত্রের দিকে তাকালেও চরম দারিদ্র্যের কথাটিই প্রথমে মনে পড়বে আপনার। ঘরে আছে একটি খাট, একটি চেয়ার, একটি আলমারি ও একটি মোড়া। জীর্ণশীর্ণ চেয়ার ও কাঠের আলমারির ভগ্নদশা দেখে মনে হবে এগুলোর বয়স সবুরার বয়সের থেকেও বেশি। শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। ঢাকা থেকে সাংবাদিক এসেছে শুনে এলেন সবুরার শ্বশুর-শাশুড়িও। জরাজীর্ণ চেয়ার ও মোড়ার অবস্থা

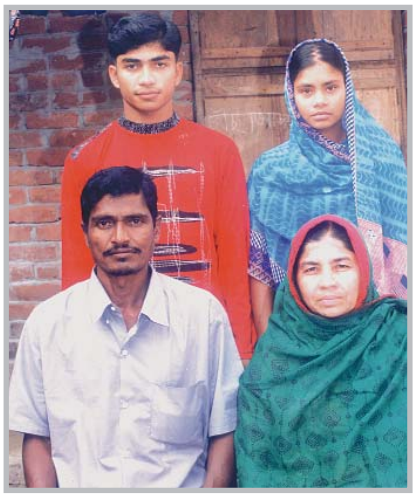

স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে সবুরা

সুবিধার নয় বিবেচনা করে ঢাকার এ অখ্যাত সাংবাদিককে বসতে বলা হলো খাটেই। শশব্যস্ত হয়ে মামাতো ভাই অনিককে দোকানে পাঠানো হলো সাংবাদিককে আপ্যায়নের জন্য। মাত্র একদিন আগে ঈদ হয়ে গেছে, পুরো বাড়িতে তার ছিটেফোঁটা চিহ্নমাত্রও নেই। টুকটাক কথা বলার ফাঁকে খাবার এসে পড়ল।

ঢাকার সাংবাদিক শুনে সবুরার শাশুড়ি যেন একটু ভয়ই পেলেন। বললেন, দেখ বাবা, এমন কিছু লিখ না যাতে আমার মেয়ে সবুরার ক্ষতি হতে পারে। উল্লেখ্য, আনসার আর বিজেএমসির আইনি মারপ্যাঁচে ৪ বছর জলে নামতে পারেননি বাংলাদেশের জলকন্যা। সবুরার পরিবারের এ গরিবি দশা দেখে সাক্ষাৎকার নেয়ার আগ্রহটা মরে গেল। ইন্টারভিউ নিয়ে কি হবে? সবুরা কি ফেরত পাবে তার জীবন থেকে খসে যাওয়া ৪টি বছর। কখনও নাগাল পাবে একটা মানসম্মত জীবনের। আমলাবাসী কি তাদের প্রাণের দাবি সুইমিংপুল দেখতে পাবে ইহজনমেও? কিংবা সেসব ক্ষুদে সবুরা কিংবা রুবেল রানারা কি পাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, যা ক্ষুদে সাঁতারুদের অনুপ্রাণিত করবে আরও বড় কিছু হওয়ার।

কয়েকটা ছবি চাইলাম; কিন্তু কোনো অ্যালবাম নেই বাড়িতে। যার অর্থ হচ্ছে, ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে। ছোট ছোট স্টুডিও থেকে পাওয়া কিছু অ্যালবাম খুঁজে খুঁজে বের করলেন সবুরার শ্বশুর। এ ছবি উদ্ধারযজ্ঞে শরিক হলেন সবুরার শাশুড়িও। তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। আশ্বাস দিলেন ছবি পরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি রেখেছে এ পরিবার। ঢাকার ঠিকানায় ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। ছবি খোঁজার সময়ে পরিবারের সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়। আমির আলী মানে শরীফের বাবা বললেন, টিভিতে ছেলের বউকে যখন দেখি খুব ভালো লাগে। উল্লেখ্য, ১৪ ইঞ্চি একটা সাদাকালো টিভি অবশ্য আছে সবুরাদের ঘরে।

সবুরাদের ঘরে প্রবেশের পর আমার মনে হলো গড়াই সুইমিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমেদের সেই কথাটি। খুব আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, আমলার সাঁতারুদের কেউ নেই। এই যে এতবড় সাঁতারু সবুরা তার জন্য কেউ কি কিছু করেছে? টিভি তো দূরে থাক রেডিওর বিজ্ঞাপনও তৈরি হয়নি সবুরাকে নিয়ে। অথচ সোনা জিতলে শুধু হাততালি আর হাততালি। সবুরাকে দিয়ে টিভি অ্যাড তৈরি করা হলে সাঁতারুরা কিভাবে অনুপ্রাণিত হতো সেটা ভাবতেও পারবেন না? ঢাকায় ছবি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি পালন করেছে সবুরার পরিবার। নিজের বাড়িতে এ প্রতিবেদকের কাছে আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সবুরা। হ্যাঁ, দেশকে সাফ গেমসে সোনা এনে দেবেন-মাথা নিচু করে সলাজ হেসে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন। সবুরাদের জন্য কেউ কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করেনি; কিন্তু বছরের পর বছর ধরে নিজেদের সবটুকু সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হয় সবুরাদেরই।

তারপরও যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া

আমলার সাঁতারুরা কিছুই পায় না। তারপরও তারা অসীম উৎসাহে সাঁতার কাটে। নিজেদের যা আছে সেটাকেই তারা কাজে লাগায়। যেমন সাঁতার কাটতে হলে উঁচুতে থেকে লাফ দিতে হয়। গ্রামের পুকুরের সে সুযোগ কোথায়? সুইমিংপুল তো আর নেই। তাই বলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে আমলাবাসী? না বসে থাকেনি। স্থানীয় গড়াই সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে দু'টি পুকুরের একটিতে নির্মিত হয়েছে অস্থায়ী সুইমিংপুল। সম্পূর্ণ বাঁশ ও কাঠ দিয়ে পুকুরের ভেতরে দু'ধারের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এ সুইমিংপুল। পানি থেকে প্রায় ফুট তিনেক উঁচু এ বাঁশের সুইমিংপুল। এ বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছে অভিনব উপায়ে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে একটি করে বাঁশ। ফিল্ড প্র্যাকটিস ও পানিতে নামার সাঁতার কাটতে গেলে শিক্ষার্থীদের অসুস্থ হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এই সংকট মোকাবেলার জন্য দু'জন ডাক্তারকেও তারা রাজি করিয়েছে। দু'ডাক্তারই প্র্যাকটিস করেন কুষ্টিয়া জেলা শহরে। তাদের একজন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার রবিউল ইসলাম এবং অন্যজন রফিকুল ইসলাম তোতা। কাজ করেন সনোতে। তারা স্থানীয়, আমলার ছেলে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে তারা।

১৯৮৬-৮৭ মৌসুমে অজপাড়াগাঁ নওদা আজমপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক আমিরুল ইসলাম পত্তনি দেন এ সাঁতারু তৈরির কারখানা। মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ সাঁতারের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। বর্তমানে আনসারের কোচ আমিরুল ইসলামের সেই রোপিত স্বপ্নবীজটি আজ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে নিয়েছে মহীরুহ আকার। পুরো প্রক্রিয়াটি থেকে গেছে গুরুর মতোই। একরত্তিও বাড়েনি সাঁতারু তৈরির অবকাঠামোগত মান। একই সঙ্গে সাঁতারুদের জীবনযাত্রার মানও। তারপরও পতিত জমিনে সোনা ফলানোর কাজে অবহেলা নেই আমলাবাসীর। ■